ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ

বাংলা উপন্যাসের ধারায় ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্য

বাংলা উপন্যাসের ধারায় ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্য

শিল্পরূপ বিষয়ক আলোচনার পর—তুলনামূলক ভিত্তিতে রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্যের দিকগুলি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। বক্ষ্যমান অভিসন্দর্ভের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাংলা উপন্যাসের একেবারে সূচনাপর্ব থেকে অর্থাৎ রমাপদ পূর্ববর্তী ও সমাসাময়িক ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের পরিচয় সন্ধান করা হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় পূর্বোক্ত ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে রমাপদর স্বাতন্ত্র্যের দিকটিই প্রধানত বিবেচ্য। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র 'যুগপতি' লেখক হিসেবেই স্বীকৃত। পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকেরা এঁদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসে সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর যখন গল্পে,উপন্যাসে আপন প্রতিভার উত্তুঙ্গ শিখরে অধিষ্ঠিত,সেই বিশেষ কালপর্বে বাংলা কথাসাহিত্যে রমাপদ চৌধুরীর আবির্ভাব। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী তাঁর সাহিত্যজীবনে দুজন ব্যক্তিত্বের প্রভাবের কথা সরাসরি স্বীকার করে নিয়েছেন—একজন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যজন সুবোধ ঘোষ। বর্তমান পরিচ্ছেদে এই দুজন প্রখ্যাত লেখক ছাড়াও রমাপদ পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক কয়েকজন লেখকের উপন্যাসের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্যের দিকগুলি তুলে ধরার প্রয়াস করা যেতে পারে।

সময়ের বিস্তৃত পটভূমিকায় বহু মানুষের জীবনকথা রচনার পথিকৃত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বাংলা উপন্যাসের সীমা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং, সমসাময়িক ও অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের লেখকদের রচনায় তাঁর প্রভাব পতিত হওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে, তারাশঙ্করের প্রধান প্রধান উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের বিচরণ পরিবর্তনশীল সময়ের এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। তথাকথিত ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য জীবনাদর্শের আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে তারাশঙ্করের জীবনদর্শন। তবুও তিনি নতুন কালের দাবী উপেক্ষা করতে পারেননি। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধ্যান-ধারণার ভাঙাগড়ার নিপুণ দ্রষ্টা শিল্পী তারাশঙ্কর। স্বভাবতই গ্রামীণ সমাজের ভাঙনচিত্র তাঁর উপন্যাসে একটা বড় জায়গা পেয়েছে। যন্ত্রসভ্যতা ও কৃষিসভ্যতার বিরোধ, জমিদার ও ব্যবসায়ীদের বিরোধ, গ্রামীণ সমাজের শাসন-সংস্কার-মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিরোধের চমৎকার উদাহরণ রয়েছে তারাশঙ্করের উপন্যাসে। 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে তিনি দেখালেন গ্রামীণ সমাজ কীভাবে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। আধুনিক যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, আধুনিক শিল্পোদ্যোগ কীভাবে সংরক্ষিত গ্রামীণ সমাজের অনুশাসন ভেঙে দিচ্ছে, নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য-বিলাস-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গ্রামীণ মানুষদের প্রলুব্ধ করছে, গ্রামীণ মানুষের জীবনের গভীরে প্রোথিত বহুকালের সঞ্চিত সংস্কার-ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি ক্রমশ শিথিল হয়ে যাচ্ছে—যুগের এই পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া যায় এই উপন্যাসদ্বয়ের মধ্যে। " সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসের নায়ক চাষীর ছেলে সীতারাম যেদিন নতুন কালের রেওয়াজ অনুযায়ী স্থানীয় হাই স্কুলে পড়তে গিয়েছিল, সেদিনই তার বাবা রমানাথের মনে হয়েছিল পুরুষানুক্রমে বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা চাষকর্মের ধারার অবসান সূচিত হল।" [১] যে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত—সেই উপন্যাসটিও তো বৃহত্তর তাৎপর্যে নতুন সমাজ-বাস্তবতার ইতিহাস। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীও তারাশঙ্করের মতোই নতুন কালের দাবী, পুরনো ধ্যান-ধারণার স্থলে নতুন মূল্যচেতনার দাবী অগ্রাহ্য করতে পারেননি। দ্রুত বদলে যাওয়া সময়, পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন-ভাবনায়

যে প্রভূত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে—সেইসব পরিবর্তনের এক একটি কালচিহ্নকেই ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। তাছাড়া, তারাশঙ্করের রচনার সরল আন্তরিকতা ও স্পষ্টোজ্জ্বল চরিত্রসৃষ্টির কৌশলও ঔপন্যাসিক রমাপদকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

কিন্তু, একথা ঠিক যে, তারাশঙ্করের সঙ্গে বহুবিধ বিষয়ে রমাপদর পার্থক্য রয়েছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। রমাপদর উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে এক বিশেষ পর্বান্তরের কালচিহ্নস্বরূপ মাইলস্টোন। বহুবর্ষব্যাপী সাধনা ও আন্দোলনের ফলে প্রাপ্ত স্বাধীনতা মানুষের মনে যে সব প্রত্যাশার স্বপ্ন দেখিয়েছিল—তা ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ একেবারে ধুয়ে মুছে গেছে। বেকার সমস্যা তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং তারই ফলশ্রুতিতে সমাজের সর্বত্র দেখা দেয় হতাশা, অবিশ্বাস। স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, স্বজনপোষণের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন থেকে যাবতীয় শুভবোধ লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে এই সময় থেকে। তারাশঙ্কর মূলত ১৯৬৫ পূর্ব সময়কালের লেখক। ১৯৬৫-র পরে যদিও বেশ কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, তবুও তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাসগুলি এর পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে, রমাপদ চৌধুরী যদিও ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকেই উপন্যাস লিখে চলেছেন, তবুও তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধি ১৯৬৫-র পরে।

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী আদ্যন্ত নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। একমাত্র 'বনপলাশির পদাবলী' ছাড়া গ্রামীণ পটভূমিকে আশ্রয় করে তিনি আর একটিও উপন্যাস রচনা করেননি। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বহুকাল কলকাতায় বসবাস করলেও, তিনি যে নগরজীবনের শিল্পী নন; গ্রাম-জনপদের কথাকার, তাতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় তাঁর আরও কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, তিনি সম্পূর্ণত 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখক নন। জন্মভূমি বীরভূমের লাভপুর গ্রাম থেকে ডাকে গল্প পাঠাতেন 'কল্লোল' পত্রিকায়। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর কৃতিত্ব— তাঁরা তারাশঙ্করকে কলকাতায় নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু, কলকাতায় এলেও তিনি নাগরিক জীবনের কথাকার হয়ে উঠতে চাননি। শ্রদ্ধেয় সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানিয়েছেন—

> বীরভূমের গ্রামে যে পরিবেশে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, সেই পরিবেশকেই—মানুষ ও প্রকৃতিকে—গল্প উপন্যাসে ধরে নিয়েছিলেন। তিনি যে নাগরিক লেখক নন, গ্রাম-জনপদের লেখক,তাঁর দীর্ঘ রচনাতালিকাতেই তা প্রমাণিত হয়। 'মন্বন্তর' (১৯৪৩), 'ঝড় ও ঝরাপাতা' (১৯৪৬) শিল্পসৃষ্টি হিসাবে ব্যর্থ,কারণ তারাশঙ্করের মনোযোগ তাতে আছে, অন্তরের যোগ নেই। যেখানে তিনি মাটির প্রতি, ভারতের ঐতিহ্য ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অনুগত এবং মানুষের প্রতি, রাঢ়-জনপদের উচ্চ নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও আদিবাসীদের প্রতি মমতাশীল, সেখানেই তাঁর নিঃসংশয় সাফল্য। যখনি তার বাইরে গেছেন তখনি তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।[২]

কালের দুর্বার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনই তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন। তিনি গ্রামীণ সমাজের এই পরিবর্তনের, যুগান্তরের প্রধান শিল্পী। এখানেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে, নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হিসেবে ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর সাফল্য প্রশ্নাতীত। তাছাড়াও— পূর্বোক্ত সমালোচক আরও জানিয়েছেন যে — " তারাশঙ্কর বীরভূমের এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান। সচ্ছল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে তাঁকে ধরা যায়। কিন্তু কখনোই এই সম্প্রদায়ের ছবি আঁকায় খুব একটা উৎসাহবোধ করেন নি। আসলে তাঁর ঝোঁকটা ছিল গ্রামীণ সমাজের দিকে, যে সমাজকে তিনি খুব কাছের থেকে দেখেছেন।"[৩] সমালোচক ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করকে 'সাম্প্রতিক কথাশিল্পী'ও বলতে চান নি— " সম্প্রতিকালের সংশয় অবিশ্বাস চাঞ্চল্য অশ্রদ্ধাকে তিনি কখনই বড় করে দেখেন নি। ... আমাদের এই সুপ্রাচীন ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দে

যেসব গুরু সামাজিক রাজনীতিক আর্থনীতিক পরিবর্তনের ফলে অচলায়তন সমাজ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে, তিনি সেই পরিবর্তনের, সেই যুগান্তরের শিল্পী, এখানেই তিনি আধুনিক।" [৪] সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্যেও এই বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে। তাঁর মতে, তারাশঙ্কর— " আধুনিক বাঙালি জীবনের অব্যবহিত পূর্বেকার ঐতিহ্য খুঁজেছেন,— ব্যক্তির, সমাজের কোনো কিছুরই অতীত শিকড় না চিনে ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না" [৫] ঔপন্যাসিক রমাপদ বাঙালির সামাজিক ও পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা উল্লেখমাত্র করেই সমকালের জীবনভাবনাটিকে রূপদান করবার প্রয়াস করেছেন। তাঁর 'পরাজিত সম্রাট', 'এখনই', 'পিকনিক','চড়াই', 'অভিমন্যু','অহঙ্কার' প্রভৃতি উপন্যাসে সম্প্রতিকালের নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন-ভাবনার ছবিই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির সাধনা তারাশঙ্করের জীবনে অত্যন্ত বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে আসবার জন্য তাঁকে কারাবরণ পর্যন্ত করতে হয়েছে। পরবর্তীকালে সাহিত্যসাধনায় নিমগ্ন হয়ে সেই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। তারাশঙ্করের শিবনাথ বিপ্লবী দলে যোগদান করেছে, গান্ধীজীর অহিংস গণ-আন্দোলনে সাড়া দিয়েছে, সাম্যবাদী ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে এক সময় সামন্ততান্ত্রিক উত্তরাধিকারকেও অস্বীকার করেছে। অন্যদিকে, ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী তাঁর উপন্যাসে রাজনীতিকে এক প্রকার পরিহারই করেছেন।

শিল্পরূপের দৃষ্টিকোণ থেকেও তারাশঙ্করের উপন্যাসের সঙ্গে রমাপদর উপন্যাসের বেশকিছু বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসাবলীর প্রেক্ষাপট বিস্তীর্ণ। বড় প্রেক্ষাপট, দেশ-কাল-জীবন, ব্যক্তির উপরে প্রাধান্যবিস্তারী জনপদ ও গোষ্ঠীজীবন— সেই গোষ্ঠীজীবনপ্রবাহের উপযোগী বলিষ্ঠ তুলির টান তাঁর শিল্পকর্মের একটি অন্যতম লক্ষণ। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী স্বাধীনতা-পরবর্তীকাল থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত সুদীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীকালব্যাপী বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের চলমান ছবিটিকে রূপায়িত করলেও, স্বতন্ত্রভাবে তাঁর এক একটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর উপন্যাসের 'ক্যানভাস' কিন্তু খুব একটা বড় নয়। 'আরো একজন' উপন্যাসে একালের নারী-পুরুষের বিবাহ অতিরিক্ত সম্পর্ক, 'লজ্জা' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত মানুষের লজ্জা, 'অভিমন্যু' উপন্যাসে বাঙালি বিবেকের প্রায়শ্চিত্ত, 'শেষের সীমানা' উপন্যাসে মানুষের অসহায়তা, 'স্বার্থ' উপন্যাসে বিধবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ— মধ্যবিত্ত সমাজের এক একটি চারিত্র্য-লক্ষণ ধরে ধরে তিনি এক একটি উপন্যাস রচনা করেছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তীকাল থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের গতিপ্রকৃতিকে তিনি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং পরিবর্তনশীল জীবনের এক একটি স্বরূপচিহ্নকে স্বতন্ত্রভাবে তিনি তাঁর উপন্যাস শিল্পের আধারে ফুটিয়ে তুলেছেন। তারাশঙ্করের উপন্যাসাবলীর প্লট নির্মাণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ঘটনার বহুলতা। তাঁর উপন্যাসে গোষ্ঠীজীবনের সমগ্রতা বা একনায়ক কেন্দ্রিকতা—যাই থাকুক না কেন ঘটনার প্রাচুর্যে পাঠক সবসময় সজাগ থাকতে বাধ্য। রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে ঘটনার প্রাচুর্য নেই বললেই চলে; বরং—ঘটনাবিরল উপন্যাস রচনার দিকেই তাঁর বিশেষ ঝোঁক। বিষয়বস্তুর খুঁটিনাটি বর্ণনা অর্থাৎ 'ডিটেলে'র প্রতি তারাশঙ্করের বিশেষ ঝোঁক লক্ষ করা যায়। প্রতিটি বিষয়ের খুঁটিনাটি বিবরণ না দিয়ে তিনি কিছুতেই স্বস্তি পেতেন না। রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের ছোট্ট 'ক্যানভাসে' তারাশঙ্করের মতো এত বেশি ডিটেলে যাবার সুযোগ নেই। 'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসের ঘটনাকাল বছরখানেকের মতো। অথচ এই উপন্যাটিতে অন্তত অর্ধ-শতাব্দীকালের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। তারাশঙ্কর নদীর জলে জাল ছড়িয়ে দেন, রমাপদ জালটিকে টেনে গুটিয়ে নেন। বাংলা সাহিত্যের পাঠক সমালোচকেরা সকলেই জানেন যে, তারাশঙ্কর তাঁর গল্প-উপন্যাসে নাটকীয় পরিস্থিতির সুযোগ সর্বদা গ্রহণ করেছেন। রমাপদ চৌধুরীর বেশিরভাগ উপন্যাসের সূচনাবাক্যের মধ্যে একটা কৌতূহল সৃষ্টির প্রয়াস রয়েছে

এবং দু'একটি উপন্যাসের ('দ্বিতীয়া','আজীবন) সমাপ্তি অংশ কিছুটা নাটকীয় হলেও উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্র কখনই নাটকীয় হয়ে উঠতে দেখা যায় না। পরিকল্পিত শান্তশিষ্ট গল্পের মধ্যেই তাঁর শিল্পকর্ম।

ঔপন্যসিক বিভূতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের বিষয়-ভাবনায় এক এবং অদ্বিতীয়। বাংলা উপন্যাসে তিনি স্বতন্ত্র ধারার ঔপন্যাসিক হিসেবেই চিহ্নিত। শুধু রমাপদ চৌধুরী নন, বাংলা সাহিত্যের যেকোনো ঔপন্যাসিকের স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ে বিভূতিভূষণের তুলনা-প্রতিতুলনা নিরর্থক বলেই মনে হয়। নগর জীবনের জটিলতা নয়,— " তাঁর কাহিনী মুখ্যত গ্রামীণ পরিবেশে রচিত গার্হস্থ্য জীবনের গল্প।" [৬] 'আরণ্যক', 'পথের পাঁচালী' ছাড়া তাঁর অপরাপর উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যের পাঠকের মনে বিশেষ দাগ কাটতে পারে নি। বিভূতিভূষণ যেখানে তাঁর নিজস্ব জীবনদৃষ্টির আলোকে প্রকৃতি ও মর্ত্য মানব-সংসারের করুণ মধুর ভালবাসার গভীর অচঞ্চল চিত্র উদ্ভাসিতকরে তুলেছেন, সেখানে তাঁর সর্বব্যাপী সার্থকতা তুলনারহিত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস রচনার কালগত পরিসীমা মোটামুটি বাইশ বছর (১৯৩৪—১৯৫৬)। এই কালপর্বে রাষ্ট্র ও সমাজে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। আগস্ট আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা এই সময়কার প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশ ও বাঙালি সমাজের সার্বিক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে—একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু, যে আর্থ-সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও নিরাপত্তা কাম্য ছিল তার সুফল সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছয় নি। ধনী আরও ধনী হয়েছে, মধ্যবিত্ত মানুষ নিষ্পিষ্ট হয়েছে, দরিদ্র মানুষ আরও দরিদ্র হয়েছে। গ্রাম ও শহরের ব্যবধান আরো বেড়েছে। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে আত্ম-প্রতারণা ও সেই সূত্রে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ, ভীরুতা, স্বার্থ চরিতার্থতার কারণে প্রতিষ্ঠানপ্রীতির প্রবণতা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল বলে এই সময়কার ঔপন্যাসিকদের আত্মিক ও সামাজিক সংকটের আবর্তে পাক খেতে হয়েছে। ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংকটাবর্তে কিছুটা দিশেহারা হলেও তিনি আত্ম-প্রতারক নন, জীবন থেকে পালিয়ে যাবার প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে একেবারেই ছিল না। বাংলা সাহিত্য-জগতে তিনি— " দুঃসাহসী লেখক, জীবনের জটিলতা ও গভীরতা অন্বেষণে সদাতৎপর" [৭] রূপেই দেখা দিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নানা পেশা ও বৃত্তির মধ্যবিত্ত মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়— ছোট-বড়-মাঝারি ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, কেরানি, বড় ও মাঝারি মাপের অফিসার, প্রাইভেট শিক্ষক, পত্রিকার বেতনভুক সম্পাদক-পরিচালক, প্রুফ-রিডার, কবি, গল্পকার, স্কুলশিক্ষিকা, যাত্রা-থিয়েটারের অভিনেতা, পাশকরা এবং হাতুড়ে ডাক্তার, নাচের মাস্টার, মধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার যুবক। তাঁর রচনাসম্ভারে নগর কলকাতা ও একই সঙ্গে কলকাতা ও গ্রামীণ পটভূমি রয়েছে—এমন উপন্যাসের একটা তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে—

উপন্যাস	প্রকাশকাল	পটভূমি
জননী	১৯৩৫	কলকাতা, বনগাঁ
পুতুল নাচের ইতিকথা	১৯৩৬	পূর্ববঙ্গের নদীতীরস্থ একটি গ্রাম ও কিছুটা শহর কলকাতা
জীবনের জটিলতা	১৯৩৬	কলকাতা
অমৃতস্য পুত্রাঃ	১৯৩৮	কলকাতা ও কিছুটা গ্রাম
সহরতলী	১৯৪০	কলকাতা শহরতলী
ধরা-বাঁধা জীবন	১৯৪২	কলকাতা
সহরবাসের ইতিকথা	১৯৪০	কলকাতা ও স্বল্পত একটি গ্রাম

প্রতিবিম্ব	১৯৪৩	কলকাতা ও একটি গ্রাম
দর্পণ	১৯৪৫	কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গের কোনো একটি গ্রাম, সীমান্তের কোনো এক বনাঞ্চল
চিহ্ন	১৯৪৭	কলকাতা
আদায়ের ইতিহাস	১৯৪৭	কলকাতা
চতুষ্কোণ	১৯৪৮	কলকাতা
পেশা	১৯৫১	কলকাতা
স্বাধীনতার স্বাদ	১৯৫১	কলকাতা
সোনার চেয়ে দামী	১৯৫১-'৫২	কলকাতা
ছন্দপতন	১৯৫১	কলকাতা
পাশাপাশি	১৯৫২	কলকাতা
সার্বজনীন	১৯৫২	কলকাতা ও শহরতলী
আরোগ্য	১৯৫৩	কলকাতা ও শহরতলী
নাগপাশ	১৯৫৩	কলকাতা ও একটি গ্রাম
চালচলন	১৯৫৩	কলকাতা
হরফ	১৯৫৪	কলকাতা
শুভাশুভ	১৯৫৪	কলকাতা
পরাধীন প্রেম	১৯৫৪	কলকাতা
প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান	মৃত্যুর পর প্রকাশিত	কলকাতা
মাশুল,	মৃত্যুর পর প্রকাশিত	কলকাতা
শান্তিলতা	মৃত্যুর পর প্রকাশিত	কলকাতা

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়পর্বে রচিত উপন্যাসে কলকাতা ও শহরতলী বা গ্রামীণ প্রেক্ষাপটকে পটভূমি করে তুলেছেন। ১৯৪৭ এবং তার পরবর্তীকাল থেকে তাঁর উপন্যাসে কলকাতার কথাই বেশি করে এসেছে। উপন্যাসের স্থানিক পটভূমির প্রতি লক্ষ করলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে যে, তিনি তাঁর উপন্যাসাবলীর মধ্য দিয়ে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হয়ে উঠতে চেয়েছেন। কিন্তু, লক্ষণীয় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের পরে তিনি যেসব উপন্যাস লিখেছেন, সেখানে লেখকের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ, উদ্বাস্তু সমস্যার কথাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। রাজনীতিকে যেখানে বর্জন করেছেন, সেখানে তিনি যৌনতার দর্শন রচনায় মনোযোগী হয়েছেন। আর— উপন্যাস রচনার প্রথম পর্যায়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের পাশাপাশি উঠে এসেছে নানা পেশা ও বৃত্তির নিম্নতর শ্রেণির মানুষ—মূলত শহর ও শহরতলীর বস্তিবাসী মানুষ, গ্রামীণ নিম্নবিত্তের মানুষ। এই পর্বের উপন্যাসে শহর কলকাতার পটভূমি থাকলেও শহুরে নাগরিক মধবিত্ত জীবনের সার্বিক চিত্র ফুটে ওঠে নি। 'জননী' উপন্যাসের স্থানিক পটভূমি কলকাতা ও বনগাঁ অঞ্চল। কিন্তু, উপন্যাসটির মূল বিষয় নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের জটিলতা সন্ধান নয়, বরং —

> জননীর মানুষেরা সবাই বেশ সাধারণ। কারুর কোন ফিলজফি নেই, কোন অন্বেষণ নেই। মামা সামান্য ব্যতিক্রম কিনা ভেবে দেখা যাবে। প্রেসের কর্মচারী শীতল, গ্রাম্য জোতদার রাখাল, গর্বিত ধনী গৃহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া,

> নব্বুই টাকার গম্ভীর কেরানি বিধান, মেরুদণ্ডহীন ফেরিওলা বনবিহারী। এরা এত মামুলি যে ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু বিচিত্র পাপে বিকারে ব্যাধিতে প্রসাধনে মনের গোপন কোণের ছিটেফোঁটা অশুচি ভাবনায় এরা একটি স্বতন্ত্র মুখশ্রী।[৮]

'পুতুল নাচের ইতিকথা'র নায়ক শশীর আধ-খানা মন নাগরিক। তার কলকাতা বা বিদেশ যাবার স্বপ্ন, লাল টাইলে-ছাওয়া বাংলো, কেয়ারি করা ফুলবাগান, কেনারি পাখীর খাঁচা, সুন্দরী বউ-এর স্বপ্ন দিবাস্বপ্ন হয়েই থেকে যায়। 'সহরবাসের ইতিকথা' উপন্যাসে শহরের পরিচয় কিছুটা অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটিতে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন খণ্ড খণ্ড ইতস্তত বর্ণনায় এবং সংলাপের মধ্যে ফুটে উঠতে দেখা যায়। আসলে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এবং 'সহরবাসের ইতিকথা' উপন্যাসদ্বয় রচনার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের মধ্যেকার অসামঞ্জস্য দূরীকরণের একটা experiment রয়েছে। শশী গ্রামের ছেলে হলেও উপন্যাসে তার যাত্রা শহর থেকে গ্রামে এবং উপন্যাসটির মূল সমস্যা গ্রামে নিজেকে সুবিন্যস্ত করা—

> গ্রাম শহরের মধ্যে শশীর এই আন্দোলন শুধু শশীর ব্যক্তিগত যন্ত্রণা নয়, সে যেন হয়ে উঠেছে আমাদের ঔপনিবেশিক সমাজ জীবনে ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের শিকড়হীনতার প্রতিভূ ... ছিন্নমূল শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের অন্তর্দ্বন্দ্বের সামাজিক চেহারা শশীর মধ্যে রূপ পায়। ...নিজের গ্রামে ফিরে নিঃসঙ্গ ও নির্মূল বোধ করে শশী, গ্রামের মানুষ ও পরিবেশের প্রতি বোধ করে দারুণ বিতৃষ্ণা।[৯]

অন্যদিকে 'সহরবাসের ইতিকথা' উপন্যাসের নায়ক মোহনের যাত্রা গ্রাম থেকে শহরে। কিন্তু, শহরে তার সমস্যা— সেখানকার চলিষ্ণু জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর, বৈষয়িক দিক থেকে উচ্চশ্রেণির সমকক্ষ হবার। বাড়ি, গাড়ি, সঙ্গী ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি তীব্র আসক্তি মোহনের শহরবাসের অন্যতম কারণ। সর্বোপরি স্বপরিবারের ভাঙনের মুখে তার প্রচুর টাকা চাই। টাকা আছে শহরে— সেখানে গিয়ে প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারলেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মোহনের শহরবাসের মূল প্রেরণা অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু—

> মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বলে মোহন অর্থের প্রতি লোভকে এমন এক শোভন ভাবে একটা আবরণের আড়ালে নিয়ে যায়, অথচ শ্রীপতি ও পীতাম্বর তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ না হওয়ায় কলকাতা যাওয়া সম্পর্কে নিজেদের উদ্দেশ্য 'পয়সা কামাবো' গোপন রাখে না, এবং এই উদ্দেশ্য স্পষ্ট বলেই এরা দুজনেই শহরের দ্রুতলয়ের সঙ্গে মোহনের চেয়ে অতিদ্রুত নিজেদের বদলিয়ে নিতে পারে, আর নতুন পরিবেশে 'সামাজিক, পারিবারিক,দৈহিক ও মানসিক জীবন নির্দিষ্ট ভিত্তি' পাওয়ার পর চিরাচরিত রীতিতে মধ্যবিত্ত যুবকের মতো রোমান্টিক তন্ময়তায় মোহন 'কি যেন গড়িয়া তোলার আয়োজনের মতো শহরের জীবনকে সে কল্পনা করিত' তার অনুসন্ধানে নানা জল্পনা-কল্পনায় কালক্ষেপ করে।[১০]

লক্ষণীয়, 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠলেও, 'সহরবাসের ইতিকথা' উপন্যাসে নাগরিক জীবনের সামগ্রিক চিত্রটি খুব একটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। শহরের নানা স্তর থেকে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র তুলে ধরার মধ্যে লেখকের সে ইচ্ছেও হয়ত ছিল, কিন্তু কোন চিত্রই সম্পূর্ণ সুবিন্যস্তভাবে পরিবেশিত হয় নি। উপন্যাসটির শেষের দিকে মোহনের দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনি পরিচালিত না হয়ে পীতাম্বর, শ্রীপতি, নগেন, ঝর্ণা প্রভৃতি চরিত্রের কার্যকলাপ গুরুত্ব পেয়েছে। 'সহরতলী' উপন্যাসেও নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র নেই। উপন্যাসটিতে বরং যশোদার কণ্ঠে তথাকথিত উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষেরা তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায় সমালোচিত হয়েছে। সমালোচক কার্তিক লাহিড়ী মহাশয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস পর্যালোচনা করে স্পষ্টতই ঘোষণা করেছেন যে— " ঔপন্যাসিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পল্লীগ্রামকে উপন্যাসের পটভূমি করেছিলেন। 'শহরতলী' পর্যন্ত রচিত উপন্যাসে শহরের কথা থাকলেও নাগরিক আবেষ্টনী প্রাধান্য পায় নি।" [১১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' বা 'সহরবাসের ইতিকথা' উপন্যাসের সঙ্গে কিছুটা ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে রমাপদ চৌধুরীর 'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসের। 'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসে গ্রামের সন্তান গিরিজাপ্রসাদ ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষকতার চাকুরি নিয়ে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন শহরে। চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর তিনি ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর জন্মভূমি বনপলাশি গ্রামে। গিরিজাপ্রসাদ আদর্শবান মানুষ,দীর্ঘদিন শহরে বসবাস করলেও কখনই টাকার পেছনে ছোটেন নি। চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর সামান্য সঞ্চয় দিয়ে শহরে থাকা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি গ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু, ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও দীর্ঘকাল শহরে বসবাসের ফলে তিনি কিছু বিশিষ্ট গুণাবলী অর্জন করেন। তাঁর সমগ্র জীবনটাই তার ফলে এই অর্জিত গুণাবলীর দ্বারা নিরূপিত হয়ে পড়ে। গিরিজাপ্রসাদও শেষপর্যন্ত গ্রাম-জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলেন না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শশী গ্রামে থেকে যাওয়াই স্থির করেছিল। কিন্তু, রমাপদর 'বলপলাশির পদাবলী'র হতাশ গিরিজাপ্রসাদকে পুনরায় গ্রাম ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির এক দশকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে এখনও যোজন যোজন দূরত্ব থেকেই গেছে—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর বিষয়টিকে পুনরায় তুলে ধরলেন ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী। বস্তুত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে কলকাতা পটভূমি হয়ে উঠলেও শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনসমগ্রতার পরিচয় তাঁর উপন্যাসে নেই। এখানেই রমাপদ পৃথক হয়ে গেলেন। তাছাড়া, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, জীবনের প্রতি নির্মোহ, নিরাসক্ত দৃষ্টির উত্তরাধিকারীও নন রমাপদ। মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন সমালোচনায় নিরাসক্ত হলেও তাদের জীবনের ছবিটিকে সদর্থক মূল্যবোধের জগতে প্রতিষ্ঠিত করবার বাসনা অত্যন্ত প্রবলভাবেই অনুভব করেন ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের পর্যালোচনা করতেও কখনও দেখা যায় নি রমাপদকে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা উপন্যাসে প্রধানত বস্তিবাসী— শোষিত, নিপীড়িত মানুষ এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের ছবিটিকেই পরিস্ফুট করে তুলেছেন। মহানগরের অঙ্গস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে বহুবিচিত্র মানুষের জীবন-জীবিকার সন্ধানে আনাগোনার প্রসঙ্গ তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছে। বস্তুত, প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর কলকাতার অঙ্গস্ফীতি একটা প্রধান সমাজ-অর্থনৈতিক বাস্তবতা। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই সমাজ-বাস্তবতাকে উপন্যাসে ধারণ করেছেন। এদিক থেকে তিনি একান্তই আধুনিক। তবে, নগর কলকাতার মূলস্রোতের অন্তর্গত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের চেহারাটিকে তিনি তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেননি বললেই চলে। তাঁর 'পাঁক' বস্তিজীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস। 'মিছিল' উপন্যাসে সমকালীন শহুরে নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি উঠে এসেছে। 'অসহযোগ আন্দোলনে' যুক্ত থাকা জেলখাটা দুই যুবক উপন্যাসের প্রধান পাত্র। স্বদেশী করা ছেলেদের একটা হতদরিদ্র মেস, বেকার-সমস্যার তীব্রতা, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা, স্বাধীনতা-আন্দোলন নিয়ে কিছুটা বিতর্ক, কালীঘাটে তীর্থ করতে আসা একদল লোকের সমস্যা— কোনো সংঘবদ্ধ গল্প নয়, উপন্যাসটিতে ঘটনার পর ঘটনা গেঁথে তোলা হয়েছে। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী যেহেতু মূলত স্বাধীনতা-পরবর্তী শহর কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনিকেই উপন্যাসের প্রধান বিষয় করে তুলেছেন এবং প্রকরণের দিক থেকে—ঘটনার পর ঘটনাকে সাজিয়ে তোলার প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না, সেহেতু ঔপন্যাসিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান বিস্তর। 'আগামীকাল' নগর কলকাতার বহুবিচিত্র মানুষের জীবনের ছবিটি চিত্রিত। আয়তনে খুব একটা বড় না হলেও উপন্যাসটির বিষয়ের মধ্যে বৃহত্তর ক্যানভাসের ব্যাপার ছিল। কলকাতা মহানগরী ক্রমে বড় হচ্ছে। পল্লীপ্রায় শহর-প্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলি শহরতলী নাম নিয়ে উঠে আসছে শহরের দিকে। ঔপন্যাসিক রমাপদ স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে স্ফীত মহানগরেরই পটভূমিকেই আশ্রয় করলেন। বস্তি আর শহরতলীর জীবন নিয়ে

অনেকেই লিখেছেন, রমাপদ ঢুকে গেলেন শহরের অভ্যন্তরে এবং তুলে ধরলেন সেখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের ছবিটিকে। 'উপনায়ন' উপন্যাসটির প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে রমাপদর 'প্রথম প্রহর' উপন্যাসটির। সাদৃশ্য বলতে উভয় উপন্যাসই আসলে নায়কের 'হয়ে ওঠা'। কিন্তু, এই 'হয়ে ওঠা'র উপন্যাস যে বিস্তার দাবী করে, 'উপনায়ন'-এর লেখক উপন্যাসটিকে সেই বিস্তার দিলেন না। তুলনায় রমাপদ চৌধুরীর 'প্রথম প্রহর' অনেক বেশি সার্থকতার পরিচয় বহন করে।

"লিখতে শুরু করেছি যখন, তখন আমাদের সামনে দুটি পথ—তারাশঙ্কর আর সুবোধ ঘোষ ... সুবোধ ঘোষ আমাকে শুধু ভাষার আমন্ত্রণেই মুগ্ধ করেননি, আঞ্চলিক অভিজ্ঞতার মিলটাও বোধ হয় অন্যতম কারণ। কিংবা অভিজ্ঞতাই নয়, ওই বিচিত্র জগৎ আর বিচিত্র মানুষগুলির প্রতি অবোধ্য এক আকর্ষণ ছিল আমার মনে।"[১২]— তারাশঙ্করের ন্যায় সুবোধ ঘোষও রমাপদর আদর্শ। নতুনকালের মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রকৃত চেহারাটি বারবার ফুটে উঠতে দেখা যায় সুবোধ ঘোষের গল্প-উপন্যাসে। প্রচলিত মূল্যবোধে সংশয়, মানুষের স্বার্থপরতা, ভণ্ডামির বাস্তব চিত্র সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন সুবোধ ঘোষ। সুবোধ ঘোষের গল্প রচনার টেকনিক, ঝকমকে ভাষা, চরিত্রসৃষ্টির কৌশল খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই আয়ত্ত করেছিলেন রমাপদ। কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ প্রায় তিন শ' ছোটগল্পের পাশাপাশি বত্রিশটি উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু, বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে গল্পকার সুবোধ ঘোষ যতটা জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান, উপন্যাস রচনায় ততটা নন। তাঁর 'অযান্ত্রিক', 'ফসিল', 'গোত্রান্তর' প্রভৃতি ছোটগল্প বর্তমান সময়ের পাঠকদের কাছেও পরম আগ্রহ ও আলোচনার বস্তু। ছোটগল্পের তুলনায় তাঁর উপন্যাসগুলি ততটা আলোচিতও হয়নি। তবে, উপন্যাস রচনাতেও যে সুবোধ ঘোষ কতকগুলি বিশিষ্ট গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, একথা অনস্বীকার্য। কল্পনার ভাবলোককে বাস্তবে রূপায়িত করবার সামর্থ্য, ভাবের জীবনাভিসারকে রূপদানের ক্ষমতা, কাব্যময়তা ও নাটকীয়তার আশ্চর্য সমাবেশ, ঝকঝকে ভাষার স্বচ্ছ ও সাবলিল গতি, জীবন-সংঘাতের বিচিত্র আলেখ্য ও সেই সূত্রে মধ্যবিত্তের জীবনকামনার কাছে নৈতিকতা যে মূল্যহীন হয়ে পড়ে—এই দর্শনের সার্থক উপস্থাপনার ক্ষমতা ছিল ঔপন্যাসিক সুবোধ ঘোষের মধ্যে। বস্তুত, কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ তাঁর গল্পোপন্যাসে প্রধানত মধ্যবিত্ত জীবনের চেনা ছক ও ছবিটিকেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। 'সুজাতা'(১৯৫৩) উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে যেসব উক্তি বসিয়েছেন লেখক, তার মধ্য থেকে একালের মধ্যবিত্ত মানুষের বিচিত্র জীবনদর্শনের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন একালের একজন বিদগ্ধ সমালোচক।[১৩] তুলে ধরা যাক— উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের বিশিষ্ট জীবন-দর্শনের পরিচয় —

বিজয়বাবু— বিশ্বাসই জীবন।
রাধেশবাবু — জীবন হলো টাকা, আরও টাকা।
পাঁচু মুস্তাফী —জীবনটাই জুয়া, হারজিতের খেলা।
বিশ্বনাথ — জীবনটা টু-পাইস।
দেবী রায় — জীবন একটা স্পোর্ট।
নবলা — জীবন যেন রঙিন সুখের ছুটন্ত স্বপ্ন।
নন্দাদেবী — জীবন হলো সোনার গয়না, ডিজাইন বদলানোই সুখ।
পাঠকজী — জীবন হলো সন্তোখ (সন্তোষ)।
মিত্রাদেবী — ভালোয় ভালোয় সংসার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াটাই জীবন।
স্বরূপা — জীবন এক অফুরন্ত প্রতীক্ষা।

কুশলের মনে প্রশ্ন — জীবন কি পরম আকস্মিকের কতকগুলি অনিয়মের খেলা?

ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসটিতে যেসব চরিত্রের জীবনসম্পর্কিত ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁরা হলেন— পাঠকজী, রাধেশবাবু, বিজয়বাবু, মিত্রাদেবী, স্বরূপা আর কুশল। এঁদের জীবন-ভাবনার মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শনটিকে প্রকাশ করেছেন। বস্তুত, 'সুজাতা' উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের যে জীবনদর্শন—রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসেও সেগুলির প্রকাশ রয়েছে। তাঁর 'অহঙ্কার' উপন্যাসে দেখা যায়— লাভ, লোভ এবং টাকার পেছনে ছুটতে গিয়ে মধ্যবিত্ত মানুষ নিজের অহঙ্কার, আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে বসেছে। একালের নবীন প্রজন্মের কাছে আত্মমর্যাদার চেয়ে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি যে অনেক বড়—এই বিষয়টি প্রকাশিত হতে দেখা যায় 'তিনকাল' উপন্যাসে। কিন্তু, ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর বিশেষত্ব এখানেই যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে 'টাকা'র প্রয়োজনীয়তার কথা মেনে নিয়েও তিনি আমাদের জানাতে ভোলেন নি যে, 'টাকা'ই কিন্তু মানুষের সব সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে না। পর্যাপ্ত টাকা থাকা সত্ত্বেও 'একা একজীবন' উপন্যাসে চারুর জীবনের সমস্যা বা 'সুখ দুঃখ' উপন্যাসের আনন্দগোপালবাবুর অসহায়তা দূর হয় নি। আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজের এক শ্রেণির মানুষ 'জীবন'টাকে জুয়া হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত— তা না হলে 'দাগ' উপন্যাসে লটারীর টিকিটের দোকানে এত ভিড় কেন? একালের মধ্যবিত্ত সমাজের সর্বত্রই যে 'প্রতিযোগিতা'—এই সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে 'চড়াই', 'বাহিরি', 'ডুবসাঁতার' প্রভৃতি উপন্যাসে। বস্তুত, 'প্রতিযোগিতা'র অর্থই হ'ল একের জয়,অন্যের পরাজয়। কিন্তু, জীবনকে 'প্রতিযোগিতা'র মানদণ্ডে বিচার করতে গেলে যে sporting spirit থাকা প্রয়োজন—তার একান্ত অভাব রয়েছে মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে। 'ডুবসাঁতার' উপন্যাসে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেও একালের মধ্যবিত্ত মানুষ একে অন্যের সাফল্য মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। 'সুজাতা' উপন্যাসের নবলার মতোই জীবনকে 'রঙিন সুখের ছুটন্ত স্বপ্ন' ভেবেছে রমাপদ চৌধুরীর 'পাওয়া' উপন্যাসের সুবিমল-রঞ্জনা। জীবনটাকে কর্ম-কর্তব্যের মধ্যে বেঁধে না রেখে তারা পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ, অবৈধ প্রেমের আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছে। কিন্তু, ঔপন্যাসিক রমাপদ এদের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন প্রসঙ্গ রমাপদর একাধিক উপন্যাসে রয়েছে। তবে ভাঙন পরবর্তী প্রতিক্রিয়াই তাঁর রচনায় মুখ্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, ঔপন্যাসিক সুবোধ ঘোষের জীবনাদর্শ অনুসরণ করেও রমাপদ চৌধুরী আপন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি'র(১৯৪৪) রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ রমাপদ অনুসরণ করেন নি। তাছাড়া— আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সুবোধ ঘোষের 'ত্রিযামা' (১৯৫১), 'সুজাতা' (১৯৫৩), 'শিউলিবাড়ি'(১৯৬০) প্রভৃতি উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি প্রস্ফুটিত হলেও, এই উপন্যাসগুলির পটভূমি কিন্তু কলকাতা নয়—হাজারিবাগ-মালভূমি ও তার সংলগ্ন সমতলভূমি— যে প্রেক্ষিতে লেখক জীবনের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন, সেখানকার বাঙালি-অবাঙালি ধনী মধ্যবিত্ত গরীব মানুষ উপন্যাসের কুশীলব রূপে দেখা দিয়েছে। 'শতকীয়া' (১৯৫৮) আঞ্চলিক উপন্যাস। এখানে পুরুলিয়ার আদিবাসী সমাজের জীবনকে উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা হয়েছে। কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পে নানা অঞ্চলের মানুষদের কথা উঠে এলেও, উপন্যাসে তিনি কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকেই প্রধানত বেছে নিয়েছেন।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের প্রধান প্রধান ঔপন্যাসিকদের নামের তালিকায় অপরিহার্যভাবে উঠে আসে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নাম। স্বাধীনতা ও দেশভাগের সময় থেকেই বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে প্রভূত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই সময়কার প্রধান প্রধান প্রবণতা ও ঔপন্যাসিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আত্মপ্রকাশ বিষয়ে 'দেশ' পত্রিকার ২ আগস্ট ২০১৩ সংখ্যায় লেখা হয়েছে —

> স্বাধীনতা ও দেশভাগের সময় থেকেই বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে যে-পরিবর্তন আসতে শুরু করে, তা অনেকটাই নতুন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা দৈনন্দিন ধারাবাহিকতাকে নষ্ট করে দেয়। তার উপর ছিন্নমূল

মানুষের পক্ষে সম্পর্কের মূল্যবোধগুলিকে আর ধরে রাখা চলে না বলেই মনে হয়েছিল। এই পরিবেশে মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ এবং রুজি-রোজগারের আশায় ঘুরে বেড়ানো ছিন্নমূল মানুষ বেঁচে থাকার অনিবার্য প্রতিযোগিতায় যে-করেই হোক, একটু স্বস্তির জীবনে ফিরতে চেয়েছে। তার সঙ্গে মানুষের লোভ, হিংসা, ঘৃণা, যৌনতা ইত্যাদির গোপন ও নগ্ন প্রকাশ জীবনকে জটিল করে তুলেছে। অন্যদিকে আর্থিক সচ্ছলতা বা প্রতিপত্তি যাদের আছে বা হয়েছে, তাদের জীবনের নানা বিলাসিতা ও কামনাবাসনা তৃপ্তির নানা সুযোগসুবিধে বিকারের বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ পাচ্ছিল ... পুরো চল্লিশের দশক ধরেই এই সব ছবি বাংলা গল্প-উপন্যাসে ফুটতে শুরু করে। সুবোধ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র বা সমরেশ বসু প্রমুখের গল্প-উপন্যাসে কখনও সাধারণভাবে, কখনও রাজনৈতিক ঘেরাটোপে শ্রেণি নির্বিশেষে এই ছবিটিই ফুটে উঠছিল। কিন্তু উল্লিখিত প্রত্যেক লেখকদেরই সমাজ-বিশ্লেষণে নিজের-নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠছিল। একমাত্র সুবোধ ঘোষ ছাড়া উল্লিখিত সব লেখকই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর তুলনায় সাত-আট বা দশ বছরের ছোট। তুলনায় একটু বেশি বয়সেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। গল্প তিনি আগেই লিখতে শুরু করেছিলেন। তাঁর গল্পসংকলন 'খেলনা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৬-এ। প্রথম উপন্যাস 'সূর্যমুখী' তার বছর দুয়েক বাদেই লিখতে শুরু করেন।[১৪]

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাসে লেখকের প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার যেমন ছায়াপাত ঘটেছে, ঔপন্যাসিক রমাপদও ঠিক তেমনি তাঁর বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতাকেই উপন্যাসের শিল্পরূপ দিয়েছেন। দুজনে একই সময়ে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন বলে, তাঁদের উপন্যাসের মধ্যে বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বিশেষত, মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে মূল্যবোধের পরিবর্তন উভয় ঔপন্যাসিকেরই একটি প্রিয় বিষয়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রথম উপন্যাস 'সূর্যমুখী' (১৯৫১)। উপন্যাসটির পটভূমি মফস্বল শহর কুমিল্লা— " ১৯৪০-৪২ সালের সেই মফস্বল শহরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবক্ষয়ের রূপটা এখানে চিত্রিত। মূল্যবোধের বিসর্জন, উন্নতির নেশায় সব সুস্থ বুদ্ধির বিসর্জন—এই মফস্বল শহরের মধ্যবিত্তদের জীবনে দেখা গিয়েছিল।" [১৫] পরিবর্তিত সমাজ-কাঠামো, নতুন মূল্যচেতনার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারার সংকট উপন্যাসটির কেন্দ্রিয় বিষয়। রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসেও এ ধরণের সংকটের কথা বারবার উঠে এসেছে। তবে, কোনো মফস্বল শহর নয়, উঠতি শহরের 'কালচার'-এ মানিয়ে নিতে না পারার সংকটের কথা রমাপদ চৌধুরী দেখিয়েছেন নগর কলকাতার পটভূমিতে। তাঁর 'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসে গ্রাম থেকে শহরে উঠে আসা শশীবাবুর পরিবার শুধু আর্থিকভাবেই নয়, মনের দিক থেকেও সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী রচিত সর্বাধিক পরিচিত উপন্যাস 'বারো ঘর এক উঠোন' (১৯৫৫)। উপন্যাসটির বিষয়বস্তুর মর্মকথা সমালোচকের দৃষ্টিতে নিম্নরূপভাবে ধরা পড়েছে—

মধ্যবিত্তের অবক্ষয়, নীতিহীনতা, নিঃসঙ্গতা জ্যোতিরিন্দ্রর তৃতীয় উপন্যাস—প্রথম বড়ো উপন্যাস— 'বারো ঘর এক উঠোন'-এও চিত্রিত। তবে তা আরো স্পষ্ট। আরো তীক্ষ্ণ। ব্যক্তি চরিত্রের নিঃসহায় একাকিত্ব আর অপ্রতিরোধ্য অধঃপতন এই উপন্যাসেও মুখ্য হয়ে উঠেছে। এখানে বক্তব্য আরো তীক্ষ্ণ, নির্মম, নিষ্করুণ। দ্বিতীয় বিশ্বসমরকালীন শহর কলকাতার উপকণ্ঠে—শহরতলীর বস্তিবাড়ির ভাড়াটে মধ্যবিত্ত—যাদের অবস্থা পড়ে গেছে অথচ রয়ে গেছে নানা মধ্যবিত্ত সংস্কার—তাদের জীবনের অলজ্জ উন্মোচন এই উপন্যাস। শহর নয়, শহরতলী; মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক নয়, বিত্তহীন ভদ্রলোক; মানবিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি নয়, নির্লজ্জ অস্বীকৃতি; শুভ চেতনা নয়, অশুভ চেতনা—এই উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করেছে।[১৬]

উপন্যাসটি সম্পর্কে অন্য একজন আলোচকের কথায় পাই—

'বারো ঘর এক উঠোন'-এ দেখি একই উঠোনে একই শৌচাগার ব্যবহারে যেমন সামান্যতম গোপনীয়তাও চলে গেছে, তেমনি ছোটখাটো ব্যাপারেও পরস্পরের কৌতূহল, লোভ, প্রতিহিংসা, সন্দেহ, বিদ্বেষ ও রুচিবিকারের

যেন জমাট মেলা বসে গেছে। সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি'-র গল্পও তো শুনেছি, কিন্তু সে গল্প এত বিচিত্র ও বারোয়ারি নয়।[১৭]

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত মানুষ শহর কলকাতার ভাড়া-বাড়ির বাসিন্দা। কিন্তু, শুধু রমাপদ চৌধুরী কেন, বারো ঘরের বাসিন্দাদের মতো এমন বিচিত্র বারোয়ারি জীবনের শোচনীয় ট্রাজেডির ইঙ্গিত সমগ্র বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসেই বিরলপ্রায়। অন্যান্য দু'একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও রমাপদ-র উপন্যাসের আবেদন পৃথক। লক্ষণীয়, 'সূর্যমুখী' বা 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রীদের জীবনের ব্রতই হ'ল কোনোক্রমে টিকে থাকা, বেঁচে থাকা। কিন্তু, রমাপদ-র উপন্যাসে যাঁরা বয়সে প্রবীণ—তাঁদের দু'চার জনাকার কথা ছেড়ে দিলে নবীন প্রজন্মের সকলেই উচ্চাশার মই বেয়ে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছতে চায় ('চড়াই', 'অভিমন্যু', 'বাহিরি' প্রভৃতি)। বরং— জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বারো ঘরে যারা ব্যতিক্রমী চরিত্র (শিবনাথ,রুচি)—তারাই ভিড় করে আছে রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে। সম্পর্কের বিশ্লেষণে, নরনারীর অবচেতন মনোজগতের উদ্‌ঘাটনেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আলাদা। বিশেষত অবদমিত যৌনকামনার ইশারা ইঙ্গিত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যেন অনেকটাই খোলামেলাভাবে প্রকাশ করেছেন। রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা সকলেই প্রেমে শারীরিক সখ্য কামনা করে। কিন্তু, তাঁর উপন্যাসে যৌনবিকার নেই। আসলে ঔপন্যাসিক রমাপদ যৌনতাকে জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ হিসেবেই দেখাতে চেয়েছেন। 'অ্যালবামে কয়েকটি ছবি' উপন্যাসে তিনি 'শরীর' ও 'মন'-এর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন —

> পাশাপাশি দুখানা ঘর। দ্যাখো দ্যাখো,ঠিক আমাদের জীবনের মতোই, প্রেম ভালবাসার মতোই। একটার নাম দাও শরীর, আরেকটা তোমার মন। মাঝখানে একটা দরজা আছে, আছেই। তুমি যতই সেটা খিল দিয়ে আটকে রাখো, তোমার চোখ বারবার সেদিকে যাবেই। আনাগোনার জন্যেই তো এই মাঝের দরজাটা। তুমি কোন্ ঘরে আছো, তাতে কিছু যায় আসে না। তোমাকে ওই দরজাটার অন্য ঘরে পৌঁছে দিতে চাইছে।[১৮]

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের সামগ্রিক আবেদন পৃথক।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলিতে যৌথ পরিবারের ভাঙন প্রসঙ্গটিই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। ঔপন্যাসিক নিজে ছিলেন একান্নবর্তী পরিবারের মানুষ। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন ছোটবেলাতেই তাঁর মনে গভীরভাবে দাগ কেটে দিয়েছিল। মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস পূর্বে লেখা 'আত্মকথা'য় তিনি জানিয়েছেন —

> ... তখন আমি ভাঙ্গা হাই স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি। আমাদের বড়দা (আমার জ্যেঠতুতো ভাই) সেই সময় যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। এই নিয়ে দিন-কয়েক ধরে যে নানারকম আলাপ আলোচনা কথান্তর মতান্তর বাদানুবাদ হয়েছিল আমি তার বিস্তৃত বিবরণ প্রতিদিন লিখে যাচ্ছিলাম। ... যৌথ পরিবারের সেই ভাঙন আমার কৈশোর মনে খুব দাগ কেটেছিল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল পৃথগন্ন হয়ে বড়দা যেন সত্যিই আমাদের কাছ থেকে বহুদূরে চলে গেলেন! অনাত্মীয় হয়ে গেলেন! আলাদা হয়ে গিয়ে জেঠীমা আর আমাদের তেমন ভালোবাসবেন না, বউদি আর তেমন করে গল্প করবেন না। এই ধরনের আশঙ্কা আমার মনকে ছেয়ে রেখেছিল।[১৯]

বস্তুত, আগেকার দিনের ভূমিস্বত্বভোগী গ্রামীণ পারিবারিক ব্যবস্থাই ছিল একান্নবর্তী। ভূমিই ছিল তার মূল ভিত্তি। কোনো কারণে ভূমি-ভিত্তিক যৌথতা ভেঙে গেলেই গ্রামীণ একান্নবর্তী পরিবারে ফাটল দেখা দিত। ভূমির বিভাজন আর শহুরে বৃত্তি বা চাকুরির প্রতি প্রবল আকর্ষণের কারণেই একের পর এক গ্রামীণ একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙে যেতে থাকে। যৌথ পরিবারের ভাঙন নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রচুর গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে। অধিকাংশ রচনায় দেখা যায়- পরিবর্তিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মানুষকে টানছে ভাঙনের দিকে, আবার ভেঙে যাওয়া পরিবারের মানুষদের মন কখনও কখনও ফিরে যেতে চাইছে পুরনো দিনের যৌথ

সংসারের স্নেহ-মায়া-ভালোবাসার বন্ধনের দিকে। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গল্প-উপন্যাসে ভাঙনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বুঝতে চান নি যে, কালের নিয়মেই যৌথ পরিবার প্রথার ভাঙন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। পরিবার ভেঙে যাবার কারণ হিসেবে তিনি দেখেছেন মানুষের চিত্তের সঙ্কীর্ণতা, অবাঞ্ছিত স্বার্থপরতা। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন ভাঙন রুখে দিতে (রামের সুমতি)। এ কারণেই শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে ভাঙনের চিত্রগুলি এত বেশি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। খানিকটা শরৎচন্দ্রেরই মতো মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের এলাকাটিই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নিজের এলাকা। তবে, কালাতিক্রান্ত যৌথ-পরিবারের বিধি-ব্যবস্থা যে ভিতরে ভিতরে পচে গিয়েছে—নতুন যুগের এই বিশিষ্ট লক্ষণটি বুঝে নিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। এ কারণেই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প-উপন্যাসে যৌথ পরিবারের ভাঙনচিত্রগুলি শরৎচন্দ্রের মতো এতটা অশ্রুসজল হয়ে ওঠেনি। শরৎচন্দ্র বা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মতো ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীকে সে রকমভাবে কোথাও দেখা যায় নি যৌথ পরিবারের ভাঙন বিষয়ে খুব একটা উচ্চবাচ্য করতে। 'হৃদয়' উপন্যাসের নামহীন পিতা বুঝেছিলেন ছেলেরা একের পর এক আলাদা হয়ে যাবেই। 'চড়াই' উপন্যাসের আনন্দমোহনবাবুও বুঝে গিয়েছিলেন যে, ছেলেরা বাবা-মা'য়ের সংসার থেকে আলাদা হয়ে যাবেই। মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীর দেওয়া বিশাল ফ্ল্যাটে ছেলের সঙ্গে থাকাও সম্ভব নয়। রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে বারবার দেখা গেছে যে, কোনো প্রকার উচ্চরব, দুঃখের দুঃসহ ভার নয়— যৌথ পরিবারের ভাঙন সম্পন্ন হয়েছে অনেকটাই নীরবে, নিঃশব্দে। তবে তাঁর উপন্যাসে যৌথ পরিবারের ভাঙন নিয়ে খুব একটা উচ্চবাচ্য না থাকলেও ভাঙন পরবর্তী প্রতিক্রিয়া বা যৌথ পরিবার প্রথার প্রতি পিছুটান অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু, তিনি এ কথা ভালো করেই জানতেন যে, যৌথ পরিবার একবার ভেঙে গেলে তা আর কখনই জোড়া লাগে না।

ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর প্রধান প্রধান উপন্যাসে গ্রামজীবন, নগর কলকাতায় উঠে আসা কিছু গ্রামীণ পরিবারের অস্তিত্বের লড়াই, গ্রাম ও শহরের মিশেলে সামাজিক- পারিবারিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব, নগর কলকাতার সামগ্রিক অভিজ্ঞতাবঞ্চিত মধ্যবিত্তের দোলাচলতা, অসহায় আত্মসমর্পণের চিত্র অঙ্কন করেছেন। সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসাবলীর বিশেষত্ব পর্যালোচনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে — " ঔপনিবেশিক শিক্ষা নরেন্দ্রনাথকে খুব বেশি ছিন্নমূল করতে পারে নি। বাল্য ও কৈশোরের গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতাকে, গ্রামজীবনের ছোট ছোট সুখ দুঃখকে নরেন্দ্রনাথ কখনোই ভোলেন নি। গ্রামের ভদ্র ও ভদ্রেতর নানা স্তরের মানুষজন, সবই পাকা রঙে আঁকা হয়ে আছে তাঁর দ্বীপপুঞ্জ উপন্যাসটিতে।" [২০]অন্যদিকে, 'চেনা মহল' (১৯৫৩) নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সর্বাধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় উপন্যাস — " এটি লেখা শহর নিয়ে, কিন্তু এর পাত্রপাত্রীরাও গ্রামছাড়া-শহুরে; চাকরি বা বৃত্তির টানে এক প্রজন্মের শহরবাসী; কেউ বা আধা-শহুরে, কেউ সিকি-শহুরে। শহর নিয়ে লেখা বটে, কিন্তু চেনা মহলের বাসিন্দারা ভাড়াবাড়ির মানুষ, চাকরি-নির্ভর, গ্রাম থেকে উঠে আসা মধ্যবিত্ত।" [২১] সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানিয়েছেন —

> অভিজ্ঞতার তিনটি ভূখণ্ডের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ সুপরিচিত। এক, পুব বাংলার তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেকার শান্ত প্রায় নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবন, গ্রামের ভদ্র ও ভদ্রেতর সম্প্রদায়, চাষবাস পালাপার্বণ, ছোট ছোট সুখদুঃখ। যাকে বলতে পারি ভাঙ্গা-সদরদির স্মৃতিবাহী গ্রামীণ ভূখণ্ড। দুই হল, মফঃস্বল শহর ফরিদপুরের স্মৃতিবাহী ভূখণ্ড, নাগরিক না হয়েও নগরমুখী ভূখণ্ড। আর তৃতীয় হল মহানগরী কলকাতা। মহানগরীর বিপুল সমগ্রতা নয়। মধ্যবিত্তের খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জীবনযাপনের সীমায়িত এলাকা—শহর, শহরতলী, আশে-পাশের কিছু কলোনী বা উপনগর। [২২]

ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর মনের গভীরে গ্রামীণ সত্তাটিকে লালন করেছেন পরম স্নেহের সঙ্গে। এ-কালের একজন সমালোচক জানিয়েছেন —

> বিগত শতকের ছয়ের দশকে কলকাতা ও শহরতলির নগরজীবন যে দ্রুত বদলে যাচ্ছিল, বাঙালি মধ্যবিত্তের সেই মানস-সংকট ও সম্পর্কের বহুমুখি মাত্রাকে পরিবর্তিত জীবনবোধ দিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন যাঁরা, নরেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম হয়েও আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের পথ খুঁজেছেন নিরন্তর ... মনের গভীরে একটি গ্রামীণ সত্তাকে তিনি আজীবন লালন করে গেছেন। 'দ্বীপপুঞ্জ'-র সমকাল থেকেই কঠিন নগরজীবনের মধ্যে ফেলে-আসা গ্রামীণ প্রতিভাস তাঁর লেখায় ফিরে এসেছে বার বার। কলকাতার আদ্যন্ত মেট্রোপলিস বা কসমোপলিক হয়ে ওঠার যে প্রস্তুতিপর্বটি সমাজ-ইতিহাসের যৌথতায় উঠে আসছিল বিনয় ঘোষের বীক্ষণে, ষাটের দশকে তেমন কোনো নাগরিক সংকটের ব্যাসকূটে স্বেচ্ছাবন্দী থাকতে চাননি নরেন্দ্রনাথ।[২৩]

বস্তুত, পূর্বকথিত 'অভিজ্ঞতার তিন ভূখণ্ড'-র সঙ্গে পরিচিত হলেও গ্রামীণ পটভূমিই যে ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের চিত্তভূমিকে বিশেষ রূপবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে—একথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন তাঁর 'আত্মকথা'-য়—

> ছেলেবেলায় আমাদের আনাগোনা ছিল একটি পাড়ার মধ্যেই। সেই পাড়ায় নানা জাতের বাস। চাষী মুসলমান যেমন ছিল তেমনি ছিল ধোপা নাপিত কামার কুমার, ব্যবসায়ী সাহা-সম্প্রদায়, জেলে জোলা আরো বহু রকমের বৃত্তিজীবী। এদের প্রতিটি ব্যক্তি, কি প্রতিটি সম্প্রদায়ের সঙ্গেই যে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তা নয়। কিন্তু এই পটভূমি কখনো জ্ঞাতসারে কি কখনো অজ্ঞাতে আমার চিত্তভূমিকে বিশেষ ধরণের রূপবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে।[২৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ্রামীণ যৌথ পরিবারের ভাঙন রুখে দিতে চেয়েছেন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র যৌথ পরিবার ভাঙনের চিত্র রচনা করেছেন, আর ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর অধিকাংশ উপন্যাসে ভাঙন পরবর্তী নাগরিক মধ্যবিত্ত পরিবারের সংকটচিত্র রচনা করেছেন। যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়ে যে ছোট ছোট একক পরিবার তৈরি হয়েছে, ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী সেই সমস্ত একক পরিবারের কথাই বারবার তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। 'আরো একজন', ' খারিজ', 'বীজ', 'বাড়ি বদলে যায়', 'আশ্রয়', 'অহঙ্কার' প্রভৃতি উপন্যাস একক পরিবারেরই কাহিনি। শরৎচন্দ্র বা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মতো গ্রামীণ সত্তা রমাপদ-র মধ্যে নেই। রমাপদ জন্মেছেন রেলশহর খড়্গপুরে। কাজেই শরৎচন্দ্র বা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মতো গ্রামজীবনের সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ঠ নন ঔপন্যাসিক রমাপদ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের অধিকাংশ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীই যেহেতু শহর কলকাতার ভাড়াবাড়ির বাসিন্দা, সেহেতু তারা সকলেই বোধ হয় গ্রাম থেকে উঠে আসা মানুষ। বস্তুত, রমাপদ-র উপন্যাসে গ্রাম থেকে শহরে উঠে আসা মানুষ আছে ঠিকই, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনা মহল'-এর মতো এক প্রজন্মের শহরবাসী নয়। ঔপন্যাসিক রমাপদ 'বনপলাশির পদাবলী' ছাড়া গ্রামজীবনকে অবলম্বন করে একটিও উপন্যাস রচনা করেননি। তাছাড়া, এই উপন্যাসটিতে তিনি গ্রামজীবনকে দেখিয়েছেন প্রবাসী গিরিজাপ্রসাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। উপন্যাসটির 'প্রসঙ্গকথা'-য় রমাপদ নিজেই জানিয়েছেন যে —

> আমি গ্রাম দেখিনি। আমার জন্ম বেশ বড়সড় একটি রেলশহরে। শৈশব থেকে যৌবনসন্ধির কাল অবধি কেটেছে সেই শহরেই। ... পিকনিক করার মতো মন নিয়ে নানা জেলার নানা গ্রামে গিয়েছি পরবর্তী জীবনে। আমাদের নিজেদেরও একটি গ্রাম ছিল,থাকারই কথা, কারণ কলকাতা শহরটাই তো এই সেদিনের গ্রাম থেকে আসা মানুষগুলোই এ শহরে এসে শহুরে হয়েছে ... আমাদের সেই বিস্মৃত গ্রামে জীবনে আমি মাত্র তিনবার গিয়েছি।[২৫]

তবে, গ্রামীণ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার প্রত্যক্ষভাবে রমাপদ না পেলেও তাঁকে কিছুতেই গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বলা সম্ভব নয়। গ্রামজীবন, গ্রামীণ সংস্কৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন বলেই 'বনপলাশির পদাবলী'র মতো বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে তিনি গ্রামীণ সংস্কৃতি ও শহুরে সংস্কৃতির মধ্যেকার contrast দেখাতে পেরেছেন। তাছাড়া, নরেন্দ্রনাথ মিত্র দীর্ঘজীবী নন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৫৯

বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। সেদিক থেকে রমাপদর উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন ও জগৎ অনেক বেশি বিস্তৃত। একালের নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনে যে ব্যাপকতর পরিবর্তন দেখা দিয়েছে—সেই পরিবর্তন তথা ভাঙন ও নির্মাণের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে।

সন্তোষকুমার ঘোষ বয়সে রমাপদর থেকে এক বছরের বড় এবং তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'কিনু গোয়ালার গলি' লিখেছেন ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ রমাপদ-র 'প্রথম পহর' প্রকাশের প্রায় বছর চারেক পূর্বেই তিনি প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিকের মর্যাদা পেয়েছেন। সন্তোষকুমার উপন্যাস রচনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ ঔপন্যাসিকদেরই উত্তরসূরী। ঔপন্যাসিক রমাপদ বস্তিজীবনের বাস্তবতা অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করেননি। তাঁর উপন্যাসে বস্তিজীবনের কথা উঠে এসেছে বিগত শতাব্দীর একেবারে নবম দশকে ('আকাশ প্রদীপ'—১৯৮৬)। কিন্তু এই উপন্যাসটিতেও ঔপন্যাসিক বস্তিজীবনের সমগ্রতা দেখাতে চাননি। বস্তিবাসীদের জীবনসমগ্রতার পরিবর্তে বরং বস্তিবাসীদের প্রতি তথাকথিত ভদ্রলোকেদের দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে, এই উপন্যাসটিতে তথাকথিত ভদ্রলোকেদের জীবনযাত্রার প্রতি লেখকের কিছুটা বিদ্রূপাত্মক শ্লেষ বর্ষিত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে এই তথাকথিত ভদ্রলোকেদের আচার-আচরণও যে বস্তিবাসীদের তুলনায় খুব একটা উন্নত নয়— এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটির প্রকাশ আমরা 'আকাশ প্রদীপ' উপন্যাসটিতে খুঁজে পাই।

রমাপদ চৌধুরীর প্রায় সমবয়সী বিমল কর তাঁর 'দেওয়াল' উপন্যাসে মূলত নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতের চিত্র রচনাতেই মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের অভিঘাত, আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা কীভাবে পারিবারিক মূল্যবোধে ভাঙন ধরায়—এই বিষয়টিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। অবশ্য উপন্যাস রচনার শেষ পর্বে তিনি মানুষের অবচেতন মনের জটিলতা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। অন্যদিকে রমাপদ-র উপন্যাসে বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাত বিশেষ নেই বললেই চলে। 'দুটি চোখ দুটি মন' (১৯৬০;পরবর্তীকালে উপন্যাসটি 'আলো আঁধার' নামে প্রকাশিত) উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট থাকলেও, নরনারীর প্রণয়চিত্র রচনাতেই লেখক মনস্থির করেছেন। 'স্বজন'(১৯৮০) উপন্যাসে যুদ্ধের প্রসঙ্গ থাকলেও মধ্যবিত্ত বাঙালি বিবেকের কথাই উপন্যাসটিতে বড় হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ কখনই উপন্যাসের মূল চরিত্র হয়ে দেখা দেয়নি। অন্যত্র—অধিকাংশ উপন্যাসে সমকালীন জীবনের দ্বন্দ্ব, সমস্যা, জটিলতাকেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।

বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্ত জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাসের সংখ্যা সুপ্রচুর। একেবারে হাল-আমলের লেখকেরাও শহর কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত বা গ্রামীণ মধ্যবিত্তের জীবনকথা অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করে চলেছেন। কিন্তু, এত সংখ্যক উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও রমাপদ চৌধুরী আপন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী মূলত শহর কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের কথাকার, এ যাবৎকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে তিনি নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র রচনাতেই মনোযোগী এবং বাংলা সাহিত্যের আর কোনো কথাকারকে এত দীর্ঘ সময় ধরে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের একটি নির্দিষ্ট স্তর অবলম্বন করে নিবিষ্টচিত্ত থাকতে দেখা যায়নি। তিনি বাংলা উপন্যাসের জগতে স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট হবার যোগ্য দাবীদার। স্বাধীনতা-পরবর্তী সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের যে বাস্তব দলিল তিনি রচনা করলেন, তা প্রাসঙ্গিক কারণেই হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের বহু ভাঙা-গড়ার সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর উপন্যাসে।

রমাপদ চৌধুরী স্বাধীনতা-উত্তর কালের বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের কথাকার। কিন্তু, উপন্যাস রচনার প্রথম দিকে বাঙালি 'মধ্যবিত্ত' জীবনের প্রথম প্রহরের ছবিটিকে তিনি একবার দেখে নিতে চেয়েছেন। তাই প্রস্তুতিপর্বের উপন্যাস 'প্রথম প্রহর' (১৯৫৪)-এ তিনি ফিরে গিয়েছেন ব্যক্তিগত জীবনের শৈশব, কৈশোর ও বয়ঃসন্ধি পর্বে।

স্মৃতিসূত্রে তুলে এনেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় এক সামাজিক বিপ্লবের চিত্রটিকে। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হলেও, তাদের জীবনে সামাজিক—সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রথম হাওয়া লেগেছিল ইংরেজ সাহেবদের দ্বারা রেলের পত্তন (১৮৫৩)কে কেন্দ্র করে। রেল পত্তনের মাত্র চার বছরের মধ্যেই 'সিপাহী বিদ্রোহ'। এক সঙ্কটময় মুহূর্ত— ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনেরও প্রথম প্রহর। যে রেলশহরের প্রথম প্রহরের সঙ্গে রমাপদ তাঁর নিজের জীবনের প্রথম প্রহরটিকে মিলিয়ে দেখেছেন, সেই জন্মভূমি খড়্গপুরের সদ্য জমে ওঠাকে তিনি স্মৃতিসূত্রে তুলে ধরলেন উপন্যাসটিতে। সময়কালের হিসেবে তা হতে পারে ১৯২৭—'২৮ থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। উপন্যাসটির 'প্রসঙ্গকথা'য় রমাপদ জানিয়েছেন —

> রেলশহরটাকেও আমার জীবনের প্রথম প্রহরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে আরেকটা সত্য উদ্ঘাটিত হল। রেল-লাইন, লেভেল ক্রশিং, ইঞ্জিনের শান্টিং, কয়লার ধোঁয়া, রেল কারখানা, শ্রমিক আন্দোলন, রেলকুঠি— এ-সবই তো অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে ছিল আমাদের প্রত্যুষের জীবনের সঙ্গে। কিছু শুনে, কিছু পড়ে, জেনেছিলাম পিছিয়ে পড়া পিছিয়ে থাকা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে আধুনিক সভ্যতার তথা আধুনিক শিল্পোদ্যোগেরও শুরু রেলকে কেন্দ্র করেই। সেদিন ভারতবর্ষ নিশ্চয় রাতারাতি বদলে যাচ্ছিল। পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে বা নৌকোয় মানুষ আগে তীর্থযাত্রায় গিয়ে দেশ দেখতো, কিন্তু রেল দূরের মানুষকে কাছে নিয়ে এল, ভারতের নানা প্রদেশ পরস্পরকে চিনলো, কর্মজীবনে একত্রিত হ'ল, পরস্পরকে বুঝতে শিখলো। রেল তো বিপ্লবও, সামাজিক বিপ্লব। আজ আমরা বুঝতে পারি না। অস্পৃশ্যতা আজও আছে, কিন্তু এক ধাক্কায় এই যন্ত্রদানব তার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ আর হরিজন রেলের কামরায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে বাধ্য হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে এলো স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা...।[২৬]

উপন্যাসটির কালসীমার মধ্যেই ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কসূত্রে 'ট্রেড ইউনিয়ন' গঠন, প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট ইত্যাদি ঘটেছে। বাঙালির সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের ভিতটি যে কেঁপে উঠতে শুরু করেছে তার পরিচয়টি প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাসটিতে। যদিও কুসংস্কারের অচলায়তন থেকে মানুষের পুরোপুরি মুক্তিলাভ ঘটেনি। ঔপন্যাসিক বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের প্রথম প্রহরের ছবিটিকে আরেকটু ভালোভাবে চিনে নেবার জন্যেই অতঃপর 'অরণ্য আদিম' (১৯৫৭), 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ্' (১৯৫৭) ইত্যাদি উপন্যাসে আদিম কৌম সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার সংঘর্ষের প্রেক্ষিতটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস'(১৯৬০) উপন্যাসে তিনি প্রথম প্রবেশ করলেন স্বাধীনতা-উত্তর কালের পটভূমিকায় । এই উপন্যাসটিতে রমাপদ তুলে ধরলেন বাঙালি মধ্যবিত্ত মানুষের চরিত্রের প্রভূত পরিমান 'কনট্রাডিকশ্‌নে'র দিকটিকে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির এক দশক পরেই চাকুরীজীবী বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির 'ফ্যাশন্' ও 'স্ট্যাটাস' সর্বস্ব হয়ে উঠছে তার পরিচয়টিও উপন্যাসে গোপন থাকেনি। তবে, রমাপদ-র প্রস্তুতিপর্বের এই উপন্যাসগুলিতে মধ্যবিত্ত জীবনের জটিলতা খুব একটা নেই।

বিশ শতকের সপ্তম দশকে রমাপদ মোট সাতটি উপন্যাস লিখেছেন। তন্মধ্যে 'বনপলাশির পদাবলী'(১৯৬২) গ্রাম জীবন অবলম্বনে লেখা। 'আরো একজন' (১৯৬২) উপন্যাস থেকে রমাপদ ক্রমশ জীবন জটিলতার কেন্দ্রে প্রবেশের প্রয়াস করেছেন। এই উপন্যাসটিতে রমাপদ দেখিয়েছেন যে, আপাত সুখী সচ্ছল দাম্পত্য জীবনের গোপন রন্ধ্রপথ দিয়ে তৃতীয় একজনের ঢুকে পড়া, পুরুষের বহুগামিতা, নারী-পুরুষের অবাধ যৌন সংসর্গ ইত্যাদি বিষয়। 'বনপলাশীর পদাবলী'তে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের গ্রামজীবনের ছবিটিকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। পল্লীর কৃষিনির্ভর মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি আর শহুরে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির মধ্যেকার দ্বন্দ্বের ছবিটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে উপন্যাসটিতে। নাগরিক জীবনের পাশাপাশি একালের গ্রামীণ মূল্যবোধেও যে

পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, 'বনপলাশির পদাবলী'তে তার চিত্র খুবই স্পষ্ট। 'পরাজিত সম্রাট' (১৯৬৫ উপন্যাসটিতেও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে নায়কের বিবাহ অতিরিক্ত সম্পর্ক। পুরুষের বিবাহ অতিরিক্ত সম্পর্কের কথা বাংলা উপন্যাসে নতুন নয়। কিন্তু, বিষয়টিকে রমাপদ একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। উপন্যাসের নায়ক নিরুপম বেশ্যাপল্লীর পঙ্কে ডুবে গিয়েও নিজেকে দোষী ভাবতে নারাজ। যে 'পাপে'র অস্তিত্ব হাজার বছর পুরনো, একজন নিরুপম সেই নেশার হাতছানি উপেক্ষা করলেই বা কি যায় আসে। কিন্তু, যুক্তিবাদী এই নিরুপমের ভাবনায়ও যথেষ্ট দ্বিচারিতা রয়েছে। নিরুপম আধুনিক রুচির মানুষ, সে থিয়েটার দেখে; অথচ নিজের প্রণয়িনী থিয়েটারে অভিনয় করলেই দোষ। শুধু ব্যক্তিজীবনে নয়, সমাজের সর্বত্রই যে নৈতিক মূল্যবোধের যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়েছে 'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঔপন্যাসিক রমাপদ বিশ্বাস করতেন— প্রেমের কোনও কাহিনী হতে পারেনা। কারণ— 'প্রেম' একটি গভীর অনুভূতি, এক বিশুদ্ধ যন্ত্রণা। প্রেমের বহতা ধারার মধ্যেই মিশে থাকে মানুষের ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, ক্ষুদ্রতা, সন্দেহ, স্বার্থ ও লোভ। মনের সব ক'টি সচেতন স্তরের চিন্তা ও অনুভূতিকে তুলে ধরেছেন 'জনৈক নায়কের জন্মান্তর' (১৯৬৭) উপন্যাসে। উপন্যাসটিতে তিনি বাঙালি জীবনে মধ্যবিত্ত নীতিবোধের বিপর্যয় দেখিয়েছেন। ১৯৬৬—'৭০ লেখকের ভাষায় এক 'সামাজিক বিস্ফোরণের যুগ'। এই সময়কার তরুণ-তরুণীদের খোলামেলা হ'বার স্বাভাবিকতা রমাপদকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। এই প্রজন্মের যুবক-যুবতীরা প্রবীন প্রজন্মের সঙ্গে মানসিকভাবে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। প্রবীণ প্রজন্ম তাদের অনেক আচরণকেই সুনজরে দেখে না। কিন্তু, এই যুবক-যুবতীদের ভাবনার মধ্যেও যে একটা ধ্রুব মূল্যবোধ আছে— রমাপদ তাকে গুরত্ব দিয়েই রচনা করলেন 'এখনই' (১৯৬৮) এবং 'পিকনিক' (১৯৭০)। 'এখনই' এবং 'পিকনিক' উপন্যাসের তরুণ প্রজন্ম শেষপর্যন্ত মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়। তরুণ প্রজন্মের উচ্চাশার অপমৃত্যুকে রমাপদ এই উপন্যাস দুটিতে একটি বিশেষ কালের দিকচিহ্ন হিসেবেই তুলে ধরেছেন।

বিশ শতকের অষ্টম দশক রমাপদর ঔপন্যাসিক জীবনের স্বর্ণযুগ। এই দশকে প্রকাশিত এগারোটি উপন্যাসের ভাব-গভীরতা বিগত দশকে রচিত উপন্যাসগুলির তুলনায় অনেক বেশি। 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে', 'অ্যালবামে কয়েকটি ছবি', 'খারিজ', 'লজ্জা', 'হৃদয়', 'বীজ', 'দ্বিতীয়া', 'রূপ', 'চড়াই', এবং 'স্বজন' উপন্যাসগুলিতে ঔপন্যাসিক এক বিস্তৃত সময়কালের পটভূমিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে 'প্রেম', প্রেমে সংকট, প্রেমে 'শরীর' ও 'মন'-এর দ্বন্দ্ব, স্বার্থের কারণে বাঙালি মধ্যবিত্তের যূথবদ্ধ হয়ে ওঠা, বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবার ও সমাজ জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়, মধ্যবিত্তের স্ট্যাটাস সর্বস্ব হয়ে ওঠা—সেই কারণেই জীবনের সামান্য অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে গোটা পরিবারের লজ্জায় ভেঙে পড়া, শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের হৃদয়হীনতা, প্রজন্ম ব্যবধানে পুরনো মূল্যবোধের বদলে যাওয়া, যুক্তি-নির্ভরতা নয়—স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত হওয়া, বানিয়ে তোলা ইমেজ ও ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্ব, উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তের 'বৃত্ত' ভেঙে বেরিয়ে যাবার প্রাণান্তকর প্রয়াস, হীনমন্যতাবোধ, অমানবিকতা ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি বিষয়ের পাশাপাশি এক শ্রেণির মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের সদর্থক মূল্যবোধে স্থিত হবার বাসনার ছবি ফুটে উঠেছে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার মান ও মধ্যবিত্ত মানসিকতায় যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে, সেই সব পরিবর্তনের এক একটি দিকচিহ্ন ধরে নিয়ে ঔপন্যাসিক এক একটি উপন্যাস রচনা করেছেন। এই দশকে রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে তিনি ব্যক্তি চরিত্রকে চিরে চিরে দেখার মধ্য দিয়ে এক নিবিড় আত্মসমালোচনায় রত হয়েছেন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন কখনও কখনও। এই পর্বের উপন্যাসে রমাপদ দেখিয়েছেন যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষদের 'শোক', 'দুঃখবোধ', 'সহানুভূতি' বা 'সহমর্মিতা' -ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীর পেছনেও লুকিয়ে থাকে

'ক্লাস কনশাস্‌নেস'। গৃহভৃত্যের আকস্মিক মৃত্যু হলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ শোক প্রকাশ করে না, কিন্তু নিজের পরিবারের কেউ হারিয়ে গেলে যেমন পরিবারের সকলে বেদনায় ভেঙে পড়ে, তেমনি নিজেদের সমপর্যায়ভুক্ত কোনো আত্মীয়ের বা পরিচিতের গৃহে কোনো দুঃখ বিদারক ঘটনা ঘটলে অনেকটা আগ বাড়িয়েই দুঃখ প্রকাশ করতে যায়। 'লজ্জা' উপন্যাসটিতে তো ঔপন্যসিক একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষদেরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'অ্যাবনরমাল' বলে মনে হয়েছে। রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে কর্মজীবন থেকে অবসৃত নিঃসঙ্গ মানুষের হতাশার ছবি বারবার ফুটে উঠেছে। সমাজের গুণী মানুষদের মূল্যহ্রাসের এক অসাধারণ বিশ্লেষণ 'বীজ' উপন্যাস। প্রবীণের প্রতি নবীনের প্রশ্নহীন আনুগত্যের দিনও যে অতীতের ইতিহাস হতে চলেছে এই বিষয়টি ব্যঞ্জিত হয়েছে 'দ্বিতীয়া' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে বারো বছরের একটি কিশোরী মেয়ে তার বিধবা মাকে আগলে রাখার প্রয়োজনে শাসনদণ্ডটি নিজের হাতে তুলে নিতেও দ্বিধা করেনি।

বিশ শতকের নবম দশকে মধ্যবিত্ত জীবন সমালোচনায় রমাপদ অনেক বেশি কঠোর। দীপঙ্করের মতো নিষ্ঠাবান গবেষক পার্থিব জগতের সমস্ত সুখ, বিলাস ত্যাগ করে গবেষণায় নিমগ্ন থেকে কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেও সাফল্যের মুখ দেখতে পারে না। গোটা সমাজটাই যেখানে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সেখানে দীপঙ্করদের সাধনা মূল্যহীন হয়ে যেতে বাধ্য। 'বাহিরি' উপন্যাসে সচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা নিম্নবর্গীয়দের জন্য কিছু একটা করে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাইলেও রমাপদ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে এই 'কিছু একটা করার' মধ্যে তাঁদের অন্তরের যোগ থাকেনা বললেই চলে। তারা চিরকাল করুণার পাত্র হয়ে থাকলেই সচ্ছল সমাজ খুশী। নিম্নবর্গ থেকে উঠে আসা মানুষ একসময় তাদের সমকক্ষ হয়ে উঠবে — এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না সচ্ছল সমাজ। শুধু নিম্নবর্গীয় কেন, নিজেদের সমাজেরই অন্তর্গত একজন বিধবার 'আমি' হয়ে ওঠাকেই মেনে নিতে পারেনা স্বার্থবুদ্ধিসর্বস্ব মধ্যবিত্ত মানুষের সমাজ। 'স্বার্থ' উপন্যাসটি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই রচিত। 'ছাদ' উপন্যাসে দেখা যায়, সমাজে সবদিক থেকে 'সাকশেস্‌ফুল' মানুষ ছাড়া আর কারোরই মূল্য নেই। আবার— বাঙালি মধ্যবিত্ত মানুষ যতই স্ট্যাটাসসর্বস্ব, আধুনিক হয়ে উঠুক না কেন, ভেতরে ভেতরে বদলায়নি কিছুই, বদলেছে শুধু বাইরে। 'শেষের সীমানা'য় দেখা যায়- যুক্তিবাদী মানুষও অসহায় অবস্থায় পতিত হ'লে অলৌকিকের কামনা করে। বস্তুসর্বস্ব মানুষ যে যার মতো করে 'আশ্রয়' সন্ধানে রত। কেউ কেউ লাভ ও লোভের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে অহঙ্কারের নামান্তর আত্মসম্মানও বিকিয়ে বসে (অহঙ্কার)। কারও কাছে আশ্রয় বলতে বোঝায় একটা 'বাড়ি', তারা 'ভাড়াটে' পরিচয় থেকে মুক্তি চায়—'বাড়িওয়ালা' হতে চায়। বাড়ি বদলের সঙ্গে সঙ্গে যে মানুষের চরিত্রটাই বদলে যায়— এই বিশেষ দিকটি রমাপদ তুলে ধরেছেন 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসটিতে। মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে 'আশ্রয়' নানা রূপে দেখা দিলেও চৈতন্যরূপী বিবেকের আশ্রয় না পেলে যে, কোনো আশ্রয়েরই মূল্য থাকেনা, রমাপদ তা দেখিয়েছেন 'আশ্রয়' উপন্যাসটিতে।

বিশ শতকের শেষ দশকে রমাপদ যে সমস্ত উপন্যাস রচনা করেছেন, তার মধ্যে মধ্যবিত্ত মানুষের সার্বিক পরাভবের পাশাপাশি কিছু উত্থানের চিত্র, জীবনকে সদর্থক মূল্যবোধে স্থিত করবার বাসনার চিত্রটিও প্রকাশিত হয়েছে। 'রাজস্ব' উপন্যাসে সন্তানহীন দম্পতির যন্ত্রণা, 'দত্তক' নিয়ে সন্তানস্নেহের অভাব পূরণ করতে চাওয়ার মধ্যে একটা সদর্থকতা রয়েছে। কিন্তু, 'দত্তক' সন্তান প্রতিপালনের জন্যে যে উন্নত মানসিকতা থাকা দরকার তা মধ্যবিত্ত মানুষ এখনও অর্জন করতে পারেনি। 'ডুবসাঁতার' উপন্যাস পাঠ করে, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য থেকে সরে আসা, নিজেদের ছেলেমেয়েদের ক্রমাগত এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় ঠেলে দেওয়া, শেষপর্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতির কথা ভেবে- বর্তমান প্রজন্মের অভিভাবকেরা অবশ্যই সতর্ক হবেন। 'পাওয়া' উপন্যাসে একজন বিবাহবিচ্ছিন্না নারীর জীবনসংগ্রাম সত্যিই এক বড় 'পাওয়া'। ' জৈব' উপন্যাসের তনুকা অনন্যা। মানুষের সঙ্গে

মানুষের সামাজিক-পারিবারিক-প্রাতিষ্ঠানিক নানা প্রকার 'সম্পর্ক'গুলোকে তনুকা অনেক বেশি উদার, স্পষ্ট, অগোপন ও সরল করে তুলেছে। 'অংশ' উপন্যাসে রমাপদর দৃষ্টিকোণ অনেকটাই দার্শনিক। মানুষ আসলে কতকগুলো অংশের সমষ্টি। একজন মানুষ গোটা মানুষটাকে কখনই দেখতে পায়না। এ কারণেই যত অশান্তি, দুঃখ, যন্ত্রণা। 'তিনকাল' কালের ব্যবধান চিত্র। একালের মানুষের কাছে 'আত্মমর্যাদা' অপেক্ষা 'আর্থ-সামজিক নিরাপত্তা'র দিকটিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে— নতুন কালের এই বিশেষ দিকটি আশ্চর্য নিরাসক্ততার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন ঔপন্যাসিক। তবে বাঙালি মধ্যবিত্তের সার্বিক পরাভবের মধ্যেও কোথাও কোথাও কিছু না কিছু 'গর্বে'র জায়গাও রয়েছে। কিন্তু, কার যে, কোথায় গর্ব তা বোঝা খুবই মুশকিল (আজীবন)। 'বেঁচে থাকা' উপন্যাসে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ দম্পতিকেও 'বেঁচেথাকা'র প্রেরণা দিতে পেরেছেন ঔপন্যাসিক। শুধু অর্থ বা টাকা-পয়সার জন্য মানুষ কি ভয়ানক অমানুষ হয়ে উঠতে পারে, তার পরিচয়টি প্রকাশিত হয়েছে 'একা একজীবন' উপন্যাস। ঔপন্যাসিকের দৃঢ় বিশ্বাস এই অমানুষগুলোর মধ্যেও একদিন অনুশোচনা দেখা দেবে।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রমাপদ মোট চারটি উপন্যাস রচনা করেছেন। মুক্তবাজার অর্থনীতি, পুঁজির বিশ্বায়ন, উন্নত প্রযুক্তি, সর্বগ্রাসী ভোগবাদের হাত ধরে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতায় ব্যাপক বদল ঘটতে দেখা গেছে বিগত শতকের শেষ দশক থেকেই। একবিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে রমাপদ দেখালেন যে, ভোগবাদে আচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে যাবতীয় সম্পর্কের ভিত্তিই হ'ল 'টাকা'। সকলেই ছুটে চলেছে টাকার পেছনে (মানুষের সংসার)। কিন্তু, 'টাকা' জীবনের সব সমস্যার একমাত্র সমাধান নয়। 'একা একজীবন' উপন্যাসে 'টাকা'র অক্ষমতার দিকটিকে তুলে ধরা হয়েছে। মধ্যবিত্ত মানুষের কোথাও তৃপ্তি নেই, কোথাও শান্তি নেই। যে যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয় সকলকেই তাড়িত করে । বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে এক আত্যন্তিক ভয়ের আবহ। 'ভবিষ্যৎ' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন যে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ই আধুনিক মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সমস্যা। 'সুখ দুঃখ' উপন্যাসটিতেও রোগব্যাধির কাছে অসহায় মানুষের কাছে ভবিষ্যতের ভয়ই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সর্বশেষ উপন্যাস 'পশ্চাৎপট'। বাস্তব জীবনে প্রতিটি শিক্ষিত মানুষই শিক্ষা-দীক্ষায়, কর্মে- প্রতিষ্ঠানে সর্বত্রই 'ইনডিভিজুয়াল' হয়ে ওঠার জন্যে সংগ্রাম করে গেলেও কেউই শেষপর্যন্ত একক ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে না। পারিবারিক উত্তরাধিকার সকলেরই 'পশ্চাৎপট'। পারিবারিক মূল্যবোধের প্রতি প্রবল আস্থা পোষণ করেই রমাপদ তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর, দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় অসাধারণ সিদ্ধি অর্জন করেছেন ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী। তাঁর উপন্যাসাবলী বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের মূল্যবান দলিল।

নির্দেশিকা ঃ

১. 'তারাশঙ্কর ঃ দ্বন্দ্বের শিল্পী, দ্বন্দ্বের শিকার', আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস—অশ্রুকুমার সিকদার। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, মার্চ ২০০৩। অরুণা প্রকাশনী। কল—৬। পৃষ্ঠা—১১৪।

২. কালের প্রতিমা—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১০। দে'জ পাবলিশিং। কল—৭৩। পৃষ্ঠা-২০।

৩. তদেব। পৃষ্ঠা—২৫।

৪. তদেব। পৃষ্ঠা—২০।

৫. 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' (৪)— ক্ষেত্র গুপ্ত। প্রথম প্রকাশ— আগস্ট ২০০২। গ্রন্থনিলয়। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা—২৭।

৬. 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য'— গোপিকানাথ রায়চৌধুরী। তৃতীয় দে'জ সংস্করণ,আগস্ট ২০১০। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা —২৮৭।

৭. কালের প্রতিমা—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১০। দে'জ পাবলিশিং। কল—৭৩। পৃষ্ঠা-৮১।

৮. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস(৫)— ক্ষেত্র গুপ্ত। প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫। গ্রন্থ নিলয়। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা—৪১।

৯. 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় :আদি উপন্যাস, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস—অশ্রুকুমার সিকদার। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, মার্চ ২০০৩। অরুণা প্রকাশনী। কল—৬। পৃষ্ঠা—২১৫।

১০. 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস', বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস—কার্তিক লাহিড়ী। প্রথম পরিবর্ধিত সংস্করণ, অগ্রহায়ন ১৪০৫। অরুণা প্রকাশনী। কল—৬। পৃষ্ঠা—৫৯।

১১. তদেব। পৃষ্ঠা—৬৬।

১২. 'লেখালেখি', গদ্য সংগ্রহ—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১১। এবং মুশায়েরা। কল—৭৩। পৃষ্ঠা—১৭০-'৭১।

১৩. মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯। দে'জ পাবলিশিং। কল—৭৩। পৃষ্ঠা—৩০৭।

১৪. 'গ্রন্থলোক', 'দেশ'। লেখক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। ২ আগস্ট, ২০১৩। এ বি পি প্রাইভেট লিমিটেড। কল—১। সম্পাদক— হর্ষ দত্ত। পৃষ্ঠা—৬৫-৬৭।

১৫. মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯। দে'জ পাবলিশিং। কল—৬। পৃষ্ঠা—৩৪১।

১৬. তদেব। পৃষ্ঠা—৩৪১।

১৭. 'গ্রন্থলোক', 'দেশ'। লেখক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। ২ আগস্ট, ২০১৩। এ বি পি প্রাইভেট লিমিটেড। কল—১। সম্পাদক— হর্ষ দত্ত। পৃষ্ঠা—৬৭।

১৮. 'অ্যালবামে কয়েকটি ছবি', উপন্যাস সমগ্র (২)— রমাপদ চৌধুরী। তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ১৯৯৫। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাথা—৯। পৃষ্ঠা— ৪৫৫।

১৯. 'আত্মকথা'— নরেন্দ্রনাথ মিত্র। 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২। সম্পাদক– অশোককুমার সরকার, সংযুক্ত সম্পাদক– সাগরময় ঘোষ। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা ঃ লি ঃ। কলকাতা—১। পৃষ্ঠা—১১২।

২০. বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা—সত্যেন্দ্রনাথ রায়। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০০। দে'জ পাবলিশিং। কল—৭৩। পৃষ্ঠা—২৬৮-'৬৯।

২১. তদেব। পৃষ্ঠা—২৬৮।

২২. মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯। দে'জ পাবলিশিং। কল—৭৩। পৃষ্ঠা—১৫২।

২৩. ঋতংকর মুখোপাধ্যায়, দশম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা-১৪১৯,'উজাগর' পত্রিকা। নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা। সম্পাদক—উত্তম পুরকাইত। পৃষ্ঠা—৩১২।

২৪. 'আত্মকথা'— নরেন্দ্রনাথ মিত্র। 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২। সম্পাদক– অশোককুমার সরকার, সংযুক্ত সম্পাদক– সাগরময় ঘোষ। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা ঃ লি ঃ। কলকাতা—১। পৃষ্ঠা—১০৯।

২৫. 'প্রসঙ্গকথা', 'বনপলাশির পদাবলী', উপন্যাস সমগ্র (৪)—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯৩। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.। কল—৯। পৃষ্ঠা—৫১৭-'১৮।

২৬. 'প্রসঙ্গকথা', 'প্রথম প্রহর'; উপন্যাস সমগ্র (২)—রমাপদ চৌধুরী। তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ১৯৯৫। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা—৪৬০।